‘কবর’-এর কারিগর জসীম উদ্‌দীন

ড. ফজলুল হক সৈকত

জসীম উদ্‌দীন [জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯০৩; মৃত্যু: ১৩ মার্চ ৭৬]-এর কবিতায় গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের অনাড়ম্বর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে যথার্থ জীবনাভিজ্ঞতার আলোয়। এ কথা সর্বজনবিদিত– গ্রামজীবনের প্রতিচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মানববোধকে লালন ও সমৃদ্ধ করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার, স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-পরিসরের য থার্থ মুল্যায়ন আজও প্রায় উপেক্ষিত। মানতে দ্বিধা নেই যে, মানবপ্রীতি আর জীবন-সংকটের সঙ্গে একাত্ম যে জসীম উদ্‌দীন, তাঁকে আমরা হারাতে বসেছি ‘পল্লীকবি’ পরিচিতিব্যাপ্তির বেড়াজালে।

পল্লীর মানুষ এবং প্রকৃতি-সুষমা জসীমের কাব্যকথার প্রধান উপজীব্য হলেও তিনি সকল কালের সকল মানুষের কবি। কোনো বিশেষ দেশ-কাল কিংবা স্থান-পরিসীমার মধ্যে বিবেচ্য করলে তাঁকে অবমুল্যায়নই করা হয় বৈ-কি। তাঁকে ‘পল্লীকবি’ বা ‘গ্রামীণ কবি’ প্রভৃতি খণ্ডিত বিবেচনায় কোনো মাহাত্ম্য নেই। কবিতায় তাঁর ব্যক্তিতার যে প্রকাশমাতম, জনতার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যে ক্ষোভের বহির্প্রকাশ, তা এখন আর অপ্রকাশ নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুখপাত্র। গ্রামের কবি হিশেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে ‘দগ্ধগ্রামে’র ভাষ্যকার জসীমকে আমরা চিনতে ভুল করি। আর তাঁর প্রতিবাদী প্রবল কণ্ঠস্বরটি তাই আমাদের দৃষ্টি-সীমানার বাইরেই পড়ে থাকে পরম অবহেলায়। ‘সন্দেহ নেই জসীম উদ্‌দীন একজন আদর্শনিষ্ঠ খাঁটি বাঙালি বড় করি। তিনি যুগের কবি ছিলেন না বটে কিন্তু জাতির কবি।’ তাঁর কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার যে বীজ রোপিত, তা বাংলা কাব্যসভায় অনন্যসাধারণ। ‘জসীম উদ্‌দীন বাংলা ভাষার একমাত্র কবি, যিনি ছিলেন একাধারে লোকায়তিক, আধুনিক, গ্রামীণ, স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক। অথচ এ কালের অনেক কবি তাঁকে একটু উন্নত ধরনের লোককবির বেশি কিছু মনে করেন না।’ এই বিবেচনা ‘আধুনিক’ কবিদের নির্বুদ্বিতারই পরিচায়ক।

কবিরা সমাজ-সংসার-সংগ্রামের কথা লিখবেন। এ সব কথা লিখতে গিয়ে শব্দ চাতুরির আশ্রয় নিলে, বিশেষ কোনো কথন-ভঙ্গির আশ্রয় নিলে দোষ নেই। কিন্তু কবিতা যদি রসকথা সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাতে আনন্দের উপাদান পাওয়া গেলেও জীবনের প্রবহমানতা থেকে তার অবস্থান থাকে অনেক দুরে। বস্তুত, জীবন সম্পর্কে নীরবতা যদি কবিতার ক্যানভাস হয়, তখন তা শো-কেসের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হতে পারে– অন্য কিছু নয়। অনেক অকবিতার ভিড়ে তাই প্রকৃত কবিতা ও কবির প্রাতিস্বিকতা অন্বেষণে আমরা বিভ্রান্ত হতে থাকি প্রতিনিয়ত। প্রকৃতি এবং তার নির্মলতা কবিতার বিষয় হবে– এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যাপিত জীবনের যে বৃহত্তর পর্যায়ক্রম, তার প্রতিভাস কবিতাভূমিতে অঙ্কিত না হলে কবিতা হয়ে পড়ে জীবনবিমুখ। পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পারেন না অনেক কবিই। এই অধিক সংখ্যক নীরব কবির উদ্দেশ্যেই রুশ কবি ইভগেনি ইয়েভুতশেঙ্কো মন্তব্য করেছিলেন:

> এমন অনেক লোক আছেন যারা এই বলে গর্ব করে থাকেন যে, তারা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। এসব লোকের উচিত তাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা, কেমন করে তারা কখনো সত্য কথনে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন নীরবতাকে। কিন্তু নীরবতা যদি

সোনা হয়, তবে সে সোনা ফাঁকা। সাধারণভাবে এটা জীবন সম্বন্ধেও খাটে। এমনকি কবিতা সম্বন্ধেও– কারণ কবিতা তো খাঁটি জীবন।

জসীম উদ্‌দীন তাঁর কবিতাকে এই 'খাঁটি জীবনে'র প্রতিচ্ছায়া করতে গিয়ে সংকটকালীন মানব মনের বলিষ্ঠ বিবেকের মতো সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন।

শিল্পী যতোই নিঃসঙ্গ হোন না কেন, তাঁর ব্যক্তি-মানসের সূত্রগুলি সমাজ সংগঠনের ভেতরেই নিহিত থাকে। হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণের কাল যখন ফুরিয়ে এসেছে, বিশ শতকের সেই প্রথম দিকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষ। স্বভাবতই মুসলিম মধ্যবিত্ত তখন অপেক্ষাকৃত আশাবাদী। সুতরাং জসীম উদ্‌দীনের কবি-মানসে লোকজ জীবন ও ঐতিহ্যের প্রাধান্য কোনো প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত নয়। বরং বলা চলে বৃহত্তর বাংলার কৃষক সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে জসীম উদ্‌দীনের পরিচয় ঐতিহাসিক কারণেই প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। গ্রামবাংলা ও তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য তাঁর কবিতার শুধু উপকরণই নয়; প্রেরণাও বটে। গ্রামীণ গাথা ও পুঁথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় পুষ্ট জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-সাধনায় যে আবহমান বাংলার পরিচয় উদ্ভাসিত তা কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে অসম্পূর্ণ অথবা খণ্ডিত নয়।

'কবর' জসীম রচিত বহুল পঠিত ও নন্দিত কবিতা। বাঙালির প্রাণের আবেগ অতি বিনিড়ভাবে মিশে আছে কবিতাটির প্রতিটি পঙক্তিতে। এটি শোক-প্রকাশক কবিতা। গ্রামীণ এক চিরায়ত বৃদ্ধের কষ্টেরকাহিনি বর্ণিত হয়েছে বর্তমান কবিতায়। কবিতাটিতে যেন আমরা একটি গল্পের কাঠামোর উপস্থিতি লক্ষ্য করি; সে দিক বিবেচনায় 'কবর' কে গল্প-কবিতাও বলা চলে। পরিণত বয়সে মৃত্যুর দরোজায় দাঁড়িয়ে নাতির কাছে ফেলে-আসা দিনের বেদনার কথামালা বলে চলেছেন বৃদ্ধ। কবিতার বর্ণনা কিংবা ঘটনা-পরম্পরা বিবরণে নাটকের দৃশ্য বা চিত্রের উপস্থিতি কবিতাটির পাঠযোগ্যতা বা শ্রবণ-সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলে অনেক গুণ। গ্রাম্য এই বৃদ্ধ কয়েক বছরের ব্যবধানে হারিয়েছেন পাঁচজন প্রিয় মানুষকে। স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধু-নাতনী-মেয়ে- এই পাঁচ প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত গুমড়ে-থাকা আর্তনাদের বর্ণনাভাষ্য 'কবর' কবিতা। সাংসারিক জীবনের প্রথমভাগে, কোনো অভিযোগ-আব্দার ছাড়া, তৃপ্ত এই মানুষটি বারবার আপনজন হারানোর যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। যৌবনের প্রথম প্রহরে তিনি সুখের ঘর সাজিয়েছিলেন পুতুল খেলার বয়সপার-না-হওয়া সোনার মতো মুখের অধিকারী এক কিশোরীকে নিয়ে। বাপের বাড়িতে নাইওর গেলে তার জন্য পুঁতির মালা-তামাক-মাজন নিয়ে তাকে আনতে যেতেন বর্ণিত দাদু। আরো কত আনন্দ আর আহ্লাদের স্মৃতি রয়েছে লোকটি মনে– তার সেই বালিকা-বধুকে ঘিরে। কিন্তু প্রায়-অপরিণত বয়সে– আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সকলকে ছেড়ে, সংসারের মায় ত্যাগ করে, চলে গেছে সে পরপারে। জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ মানুষটি তার কাতর অভিব্যক্তি জানাচ্ছেন, আজ অনেকদিন পর, তার নাতির কাছে:

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।...
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়।

প্রাণপ্রিয় গিন্নির বিদায়ের অল্পকাল পর পরপারের দিকে যাতা করে বৃদ্ধের ছেলে– সে মারা যায় অজানা রোগে। তারপর তার ছেলের বউ; এই নারীর মৃত্যু ঘটে, কবিতায় বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী, স্বামী হারানোর যাতনায়। তারপর মারা যায় নাতনি– আজকের ক্যানভাসের

নাতিটির বোন। সে মারা গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির মানুষদের অমানবিক আচরণ আর বাবা-মা হারানোর বেদনায়। অতঃপর বৃদ্ধের সাতবছরের শিশু কন্যার মৃত্যু হয় সাপের দংশনে।- এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটতে-থাকা বেদনার ঘটনা গ্রাম্য- অসহায়, অশিক্ষিত, অনগ্রসর লোকটিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তার জীবনে দুঃখ নামক ঘোর-তীব্র বাতাস আরো ঘনীভূত হয়। একটি কষ্টের যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই আরেকটি কষ্ট তাকে ভয়ানকভাবে শূন্যতাবোধের অন্ধকারের অতলে ঠেলে দেয়। আশ্রয় হারানো মানুষটির জন্য বিধাতা যেন আর কোনো বিকল্প আশ্রয় রাখলেন না। এই পৃথিবীতে যাদের জীবন অতি কষ্টে গড়া, তাদের কষ্ট-যাতনার সমূহ ছবি যেন কবি 'কবর' নামক কবিতায় বর্ণিত বৃদ্ধের জীবন-কাহিনির মাধ্যমে আমাদের সামনে হাজির করতে চেয়েছেন। কবিতার শেষে অসহায়-আপনজন-হারা ব্যক্তি-মানুষটির অভিপ্রায়, সম্ভবত শেষ ইচ্ছা, প্রকাশ পায় এক চিরায়ত আকুতি বা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। লোকটি বলছে:

> ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
> অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
> মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
> মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর।

- এই আর্তি কেবল গ্রামের কোনো অসহায় লোকের নয়; গ্রামীণ-নগরবাসী- অনাধুনিক-আধুনিক, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ (বালিকা-বৃদ্ধাও বটে)- সকলের। এটি চিরন্তন কান্নার; মহাসত্যের পারিচ্ছন্ন ঘোষণা। তাই 'কবর'-এর বেদনা কেবল ওই লোকটির থাকে না- তা হয়ে ওঠে আমাদের সবার; কবিতাটির আবেদনও তাই কাল-পাত্র-পরিবেশ ছাড়িয়ে হয়ে পড়ে সকল সময়ের, সকল নারী-পুরুষের, সকল সীমানার বাসিন্দার মনের অনুভূতির সরল প্রকাশ।

জসীমউদ্‌দীন সমাজ সচেতন কবিতা-রচয়িতা। তিনি সচেতনভাবে কৃষক-মজুরদের জীবনের কথা বলেছেন। পল্লীর নির্বাসিত ভাই বোনের সুখ-দুঃখের কথা যে সাহিত্যে বিশেষরূপে স্থান পায় না- এ বেদনা তাঁকে পীড়িত করেছে। আবহমান গ্রাম-বাংলার চিরপরিচিত চিত্র ও প্রসঙ্গ রূপয়াণ করতে গিয়ে জসীম উদ্‌দীন প্রেম ও রোমান্টিকতার মোহময়তা নির্মাণ করেছেন সুকৌশলে- বাস্তব অভিজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলোয়। তাঁর এই পরিচয় সর্বমহলে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ জীবনের গীতলতায় নিমগ্ন, সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনা চিত্রণে সাবধানী কবি জসীম উদ্‌দীনকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করি তাঁর কবিতার কথামালায়। যে সমাজে লাজুকলতার মতো নতমন তরুণ-তরুণীর অবাধ বিচরণ- প্রাণের খেলা, সাধারণ মানুষের অবিরল আনন্দের ধারা, সে পরিচিত ভুবন কবিকে বারবার আহ্বান জানিয়েছে। আর তিনি সে ডাকে সাড়া দিয়ে মনের আকুতি ও আবেগ মিশিয়ে সাজিয়েছেন অতি সাধারণ মানুষের দিনলিপি আর রাতপঞ্জি। 'কবর' কবিতাটি এর নির্মাতার বহু অভিজ্ঞতার, অনেক অনুভবের একটি থEচিত্র মাত্র।

ড. ফজলুল হক সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক এবং একজন বিশ্লেষনমূলক কলামলেখক।

ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন